



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 272 - 280

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব : বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিভেদে বাংলার মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও করুণ আতর্নাদের প্রতিচ্ছবি

অনুরাধা দাস

গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: dasanuradha1197@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Second World War, Famine, Starvation, Smuggling, Cholera epidemic.

Abstract

The Second World War was a turning point in the lives of people in India and across the world. Although Indians were not directly involved in the War but the war deeply affected their lives and created a new social reality. Many writers of the time responded to these changes, and Narayan Gangopadhyay was one of them, emerging in Bengali literature during the turbulent 1940s. As literature reflects society, his writings clearly show the realities of his time. A socially aware and sensitive writer, he was disturbed by contemporary events and portrayed them honestly in his stories. His works mainly depict the impact of the Second World War, especially the famine, starvation, black marketing, smuggling, and the cholera epidemic that devastated Bengal. Yet, he did not only focus on suffering, he also expressed hope for the end of famine and dreamed of a peaceful and prosperous “Golden Bengal.” His stories consistently speak of the importance of survival and love for life, as he believed that despair and loss are never final, and that standing strong and continuing to live is the greatest truth. Though his writings rooted in a particular historical moment, but his stories remain relevant and meaningful for all time.

Discussion

ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যদিও ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিল না কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতবাসীর জীবনে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। এই বিশ্বযুদ্ধ এবং এর থেকে সৃষ্ট নানা ঘটনাকে অবলম্বন করে তৎকালীন সাহিত্যিকেরা কলম হাতে নিয়েছিলেন। এঁাদেরই একজন আলোচ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। মূলত চল্লিশের দশকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার একজন অন্যতম গল্পকার। বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বে, স্বাতন্ত্র্যে চিরউজ্জ্বল তাঁর প্রতিভা—

“হঠাৎ আলোর বলকানিতে পাঠক চিত্তকে চকিত-বিস্মিত করে তাঁর আবির্ভাব নয়। তাঁর উদয়াচল নিঃশব্দ মহিমায় নতুন নক্ষত্রের প্রবজ্যোতিতে ক্রমশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে বহুভারতী আজ

যেইশ্বর্যময়ী এই বিরাট ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মহত্তর সমৃদ্ধির সম্ভবনাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। রূপে ও রসে ভাবনায় ও বেদনায় বিচিত্র তাঁর শিল্পলোক।”^১

মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতেই বিকাশ ঘটেছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায়- ‘সেদিন সর্বগ্রাসী যুদ্ধের প্রভাবে ভেঙ্গে পড়েছে জীবনের খেলাঘর, ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে শবলুক গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর, বীভৎস চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ-বাতাস; একদিকে যুদ্ধের জুয়াখেলায় কাগজিমুদ্রার ছিনিমিনি, অন্যদিকে চোরাকারবার আর কালোবাজারের নারকীয় অনাচারে পর্যুদস্ত দিনযাত্রা; সারা বাংলা জুড়ে নিরন্ন বিবস্ত্র নর-নারীর গগনভেদী হাহাকার; আর তারই বুক বসে মুনাফা শিকারি মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের দানবীয় অট্টহাসি। মহাপ্রলয়ের সন্ধি লগ্নে যেন নরক গুলজার। এই অবস্থাটাকে মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের প্রেক্ষাপট।’ (‘শতবছরের সন্ধিক্ষণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ফিরে দেখা’, ড. চিত্রিতা দত্ত সরকার)

১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল, এই সময় ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে ছিল এক চরম সংকটের সময়। এই যুদ্ধকালীন অস্থিরতার সময়ে বাংলাদেশে উদ্ভব ঘটে একদল শোষক শ্রেণির, কালোবাজারি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী লোকের। সারা বাংলায় এই মন্বন্তর ও মহামারি ছিল মানবসৃষ্ট। এই স্বার্থপর শাসকদলের শোষণের তীব্রতা মানুষের জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই চলমান জীবন থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আহরণ করেছেন তাঁর গল্পের উপকরণ। এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য -

“তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কঙ্কালের এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেদিনের সেই অসহ্য গ্লানি আর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বাঙালি লেখকের সঙ্গে আমিও গর্জন করে উঠেছি, ‘যুগান্তরে’ লিখেছি ‘নক্রচরিত’, ‘আনন্দবাজারে’ লিখেছি ‘দুঃশাসন’, ‘দেশে’ লিখেছি ‘পুষ্করা’। আরো অনেক গল্প - কিছু কিছু উপন্যাস।”^২

এক সময় লেখক প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে পার্টি প্রোগ্রামই রাজনীতির শেষ কথা নয়। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে, জীবন সম্পর্কে নতুন দীক্ষা তাঁর গল্পের উপকরণের পরিবর্তন ঘটায়। তাই তিনি নিজেই রাজনীতির সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে অবতীর্ণ হন সাহিত্যক্ষেত্রে।

১৩৫০ এর মন্বন্তর কবলিত সমগ্র বাংলায় এক অভাবনীয় পৈশাচিক জৈবিক ক্ষুধা জেগে উঠেছিল। খিদের তাড়নায় একমুঠো অন্নের জন্য, একটু ভাতের ফ্যানের আশায় অসংখ্য গ্রামের, শহরের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ দলে দলে উঠে এসেছিল শহরের পথে পথে। এই সময়কালকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রিত করেছেন তাঁর রচিত ‘নক্রচরিত’, ‘দুঃশাসন’, ‘হাড়’, ‘ডিনার’, ‘ভাঙ্গাচশমা’, ‘পুষ্করা’, ‘কালোজল’ আরো প্রভৃতি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তেতাল্লিশ এর মন্বন্তরের আর্থসামাজিক পটভূমিতে রচিত ‘হাড়’ গল্পটি। গল্পটিতে গল্পকার বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতা নগরের দুই বিপরীত শ্রেণির স্বপ্নিল ও রক্তিম চিত্রকে তুলে ধরেছেন। একদিকে বেকারত্ব অনাহার, ফুটপাত জুড়ে হাজার হাজার বুড়ু মানুষের আতর্নাদ, অপরদিকে রায়বাহাদুর এর মতো ধনী মানুষের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন সঙ্গে লক্ষ টাকার অপচয়ের ছবি। এই গল্পে চাকরির উমেদার এক বেকার যুবকের দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পীড়িত কলকাতা শহর। সর্বহারা ও বিত্তমানদের মধ্যে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ এই গল্পের কথক। শিক্ষিত বেকার যুবকটি এই বিপর্যস্ত সময়ে একটি চাকরির আশায় এসেছে পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের বাড়িতে। আসলে পিতৃবন্ধুত্বের ক্ষীণ সূত্র ধরেই কথক দারস্থ হয়েছে রায়বাহাদুরের কাছে কারণ ‘তিনি একটা কলমের খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা।’ বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই কথক বর্ণনা দিয়েছেন জাপানি বোমার ভয়ে ভীত কলকাতা নগরীর চিত্র—

“মাথার ওপর এরোপ্লেনের পাখার শব্দ - জাপানি দস্যুর আক্রমণ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে। দি লায়ন হাজ উইংস!”^৩

এর ঠিক পরমুহূর্তেই আবার তিনি কলকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের অবস্থার বর্ণনা করেছেন—

“একটু দূরেই মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয় - বুভুক্ষুর কলোনি বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়না জল। সহানুভূতি আসেনা, বেদনা আসেনা, শুধু একটা অহেতুক আশঙ্কায় মনটা শিউরে উঠে শিরশির করে। দেশজোড়া ক্ষুধা যেন মা কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে - এ ক্ষুধার আশুন কবে নিভবে কে জানে!”^৪

অতঃপর চাকরির উমেদার প্রবেশ করে পিতৃবন্ধু রায় বাহাদুরের বাড়িতে। কথকের কথা শুনে শিক্ষিত বেকার যুবকের জীবিকা সংকটের যে গুরুত্ব তা রায়বাহাদুর মহাশয় অনুভব করতে তো পারেননি উপরন্তু তাকে উপদেশের বাণীতে ভরিয়ে দেন, আবেগদীপ্ত কণ্ঠে উপদেশের ভঙ্গিতে রায়বাহাদুর কথককে বলেন -

“তারপর, চাকরি পাচ্ছনা যুদ্ধের বাজারে? এম.এ পাস করে কেরানিগিরির ওমেদারী করছ? বি এ ম্যান ইয়ং ফ্রেন্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে। চাকরি নাও অ্যাকটিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।”^৫

কথককে চাকরির পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া রায়বাহাদুরের কল্পনা প্রবণতা, বাস্তব জীবনের অজ্ঞতা, ও বুর্জোয়া মানসিকতাই প্রকট করে। আসলে যাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের জন্য ভাবতে হয়না, তাদের পক্ষে এমন অলীক কল্পনা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। রায়বাহাদুরের এসব উপদেশমূলক কথা বাইরের বুভুক্ষু মানুষের আত্ননাদের প্রেক্ষিতে হাস্যকর বলে মনে হয়। কথক রায়বাহাদুরের উপদেশ শুনে যে স্বগতোক্তি করেছেন তাতেও স্পষ্ট চিত্রিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার ছবি -

“যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বৃকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোট বিকৃত ফেনীল সমুদ্রে নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাকে কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেনা। ... আর বোমারু ঈগলের মৃত্যু-চঞ্চুর তলায় দূরবীনের শাণিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রতীক্ষা করা - আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে।”^৬

এসব কথায় রায়বাহাদুর গা ভাসাননা, উপরন্তু তিনি কথককে তাঁর হাড়ের সংগ্রহ দেখাতে, আত্মপ্রচারে উন্মুখ। কথককে হাড় দেখানোর সময় বাইরের অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের চিৎকার শুনে তিনি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। মন্তব্য করেন -

“পার্কের ওই ডেসটিচুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমানো যায় না। বোধহয় খাবার দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।”^৭

কথক যখন রায়বাহাদুরের বাড়িতে চা পান করছিলেন, তখন তাদের খাওয়ার শোভন প্রক্রিয়ার সঙ্গে কথকের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে বাইরের মানুষের খাওয়ার চিত্র। উচ্চবিত্ত ও মনস্তর পীড়িত মানুষের খাদ্য গ্রহণের এই বৈপরীত্যকে কথক বিদ্রূপ বাণে বিদ্রূপ করেছেন -

“দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে দিয়ে যেমন করে সচিৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল, মনশক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোত্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ড্যালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ সুরে আত্ননাদ করছে।”^৮

গল্পের শেষে দেখি চাকরির আশায় গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কথক রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এই দুই শ্রেণির বৈপরীত্য কথককে বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছে। কথক আহ্বান জানিয়েছেন সমাজ বদলের ঝড়কে, কিন্তু কবে আসবে সেই ঝড় তার ইঙ্গিত দিতে তিনি নিজেও অপারক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে গোটা বাংলা জুড়ে দেখা দেয় বস্ত্রসংকট। এই বস্ত্র সংকটের মূল কুশীলব চোরাকারবারি ও কালোবাজারিতে লিপ্ত এক শ্রেণির ব্যবসায়ী লোক। তারা এই যুদ্ধের বিপন্ন সময়েও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিসর্জন দিয়েছিলেন নিজের বিবেক ও মানবিকতার। বস্ত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে তারা কাপড়ের দাম এমন বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য এক্ষেত্র স্মরণযোগ্য -

“In times of stress it is extremely important to ensure an adequate supply of ... Clothing materials at a price within the purchasing power of the poor.”^৯

এই বস্ত্রসংকটকে কেন্দ্র করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেন ‘দুঃশাসন’ গল্পটি। গল্পে গল্পকার পুরাণের অনুষ্ণের মাধ্যমে যুগের দুঃশাসনকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন -

“মহাভারতের দুঃশাসন চরিত্রটি যে নির্লজ্জ পাশবিকতার প্রতীক হয়ে আছে, তাকেই এখানে প্রতীকী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ...মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায় কৌরব দুঃশাসন হরণ করেছিল দ্রৌপদীর বস্ত্র আর দুর্ভিক্ষের সময় আমরা দেখতে পাই এই মজুতদাররাই হরণ করেছে বাংলার দ্রৌপদী রূপী অসংখ্য নারীর বস্ত্র।”^{১০}

দুঃশাসন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্যবসায়ী আড়তদার দেবীদাস। আশেপাশের ৮-১০ খানা গ্রাম তারই কৃপার উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের বাজারে কাপড়গুলো সরকারি দামে বিক্রি করা যায়না তাই সে কাপড়ের মজুতদারি করতে শুরু করেছে। থানার এল. সি, দারোগা সবাইকে হাতে রেখে সে গোপনে ব্যবসা করে যাচ্ছে। সে গরিবদেরকে কাপড় দিতে অনিচ্ছুক, কারণ এই দুর্মূল্যের বাজারে তারা চড়া দামে কাপড় কিনতে পারবে না তাই সে দোকানে তালা দিয়ে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। কেউ কাপড় কিনতে আসলে কাপড় না থাকায় অজুহাত দেখিয়ে সে জানায় -

“সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাঁধলো আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারবেন সে কথা। কাপড় থাকলে কি আর তোকে দিতাম না?”^{১১}

নাছোড়বান্দা অভাবী, বস্ত্রহীন লোকটি চোখের জল ফেলে বারবার কাতর অনুরোধ জানালেও দেবীদাসের বিবেকবোধ জাগে না বরং তার মনে সেই গরীব লোকটি সম্পর্কে ভাবনা আসে -

“লোকটাকে যেন একটা লাথি মারতে পারলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে।”^{১২}

লোলুপ পৃথিবীর সামনে সে নিষ্ঠুর উপহাসের মুখে ফেলে দিয়েছে মানুষের লজ্জাকে। দেবীদাসের ভাইপো গৌরদাসকে দেখি এখানে মধ্যবিত্তের প্রতিভূ হিসাবে। দেবীদাসের এরূপ আচরণ তাকে অস্বস্তিতে ফেললেও সে কিছু করতে পারেনা। কেননা সে নিজেই কাকার আশ্রয়ে মানুষ, কাকার সাহায্যেই তার পড়াশুনা চলছে। কিছু করতে না পারলেও সে কাকার লোভ ও অমানবিকতাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারে না। গল্পটিতে পুলিশের ভূমিকাও লক্ষণীয়। পুলিশের দারোগা শচীকান্ত। তিনি প্রশাসক প্রতিনিধি। সমাজের অন্যায়-অবিচার-অনাচার-বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট রাখার দায়িত্ব যাদের কাঁধে অর্পিত তারা নিজেই ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী। এমনকি সমাজের বিশৃঙ্খলামূলক কাজের ইফন তারাই যুগিয়ে চলছে।

যুদ্ধের সময়কালে বস্ত্রসংকটের পাশাপাশি কেরোসিন তেলেরও সংকট দেখা দিয়েছিল। গল্পে দেখা যায় মুচিপাড়ায় আলো না থাকার ফলে ঘর থেকে একটি মেয়ের শিশুপুত্রকে শেয়ালে নিয়ে খেয়ে ফেলে তারই ঘর থেকে ত্রিশ হাত দূরে। কিন্তু আলোর অভাবে তারা সেই শিশুটিকে দেখতেও পায়নি, বাঁচাতেও পারেনি। সমস্ত গ্রাম অমাবস্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত অপরদিকে থানার দারোগা এই সংকটের দিনে ও ডে-লাইট জ্বালিয়ে আসর বসান ‘দুঃশাসনের রক্তপান’ নামক যাত্রাপালার। আসলে আনন্দ দিয়ে তারা ভুলিয়ে রাখতে চায় নিরন্ন নির্বস্ত্র খেটে খাওয়া লোকদের। আসলে তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ লোককে অহরহ বোকা বানিয়ে চলেছে। বস্ত্রহীন, নিরন্ন মানুষের উদ্দেশ্যে শচীকান্ত বলে -

“ওরে বোস, বোস তোরা - বসে পড়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই তো জন্যেই দেড়শো টাকা খরচা করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম। নে বসে পড়।”^{১৩}

যাত্রার অভিনয় দেখে গৌরদাসের মনে হয়, বাংলাদেশে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে। সে কথা ভেবে ভেবেই যখন কাকুর সঙ্গে মুচিপাড়া হয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন মুচিপাড়ায় নগ্ন ষোড়শী মেয়েকে দেখে সে দুঃশাসনের প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবে -

“যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?”^{১৪}

এই জিজ্ঞাসা গৌরদাসকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। তার ভাবনার মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রতিবাদী ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে। একই সঙ্গে পরান্নজীবী থাকার কারণে তার অসহায়তার চিত্রও তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের অনটনের সময় মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র আলোচ্য গল্পের পরতে পরতে বিদ্যমান।

‘নক্রচরিত’ গল্পটিও দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে যে কালোবাজারি ব্যবসা চলছিল সেই প্রেক্ষাপট অবলম্বনে লেখা। সমালোচকদের মতে –

“মুনাফালোভী মজুতদার ও কালোবাজারির দৌরাণ্যে যে দুর্ভিক্ষ ও মানবীয় অপচয় তারই সময়সচেতন শিল্পরূপ এই গল্পটি। পাশাপাশি পুলিশ ব্যবসায়ী অপরাধী আঁতাতে সামাজিক জীবন কীভাবে পুতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে তারই ইঙ্গিত রয়েছে গল্পের পরতে পরতে।”^{২৫}

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈষ্ণব নিশিকান্ত কর্মকার। সীমাহীন অর্থলোভী, ধূর্ত, জাঁদরেল মহাজন। দুর্ভিক্ষের বাজারে সে তার গুদামে মজুদ করে রেখেছে চাল। এবং এই মন্বন্তরের সময়ে তার সমস্ত অসৎকর্মে তাকে সহায়তা করে দারোগা ইব্রাহিম মিঞা। নিশিকান্ত তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করে রেখেছে। ১২ টাকা দরে যে চাল সে কিনে তার গুদাম ভর্তি করে রেখেছে বাজারে এখন সেই চালের দাম ৪০ টাকা। স্মর্তব্য তার উক্তি –

“আটশো মন চাল সে মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাল নয় - রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল - মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয়তো এইই সুযোগ।”^{২৬}

অথচ এই দুর্ভিক্ষের সময়েই খেতে না পেয়ে অনাহারে মারা গেছে তারই গ্রামের মতি ও তার স্ত্রী। মজুদ রাখা চাল এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবুও সে জনসাধারণের জন্য একটু চাল বরাদ্দ করে দিচ্ছে না। এমনিটাই বিবেকহীন মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিশিকান্ত। নিশিকান্তের এই মজুতদারির জন্যই গ্রামের মানুষগুলো অসহায় হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। নিশিকান্তের প্রতি চৌকিদারের উজ্জ্বলিত এই কথার স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় –

“শুধু এই বাড়িই নয় বাবু। এরকম চললে দু’মাসে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে! দেখুন না, দু-তিন দিনের মধ্যে আরও পাঁচ সাতটা মরার খবর।”^{২৭}

কিন্তু নিশিকান্ত নিজের দোষগুলোকে চাপা দিতে এই মানুষগুলোর অসহায়তাকে ওদের নিজেদের কৃতকর্মের ফল বলে ঘোষণা করে। গল্পে বৈষ্ণব নিশিকান্ত সেবাদাসী হিসেবে রেখেছে বিশাখা নামে এক মেয়েকে। এবং এই রক্ষিতা বিশাখাকে দারোগা ইব্রাহিমের ভোগের সামগ্রী বানিয়ে সে হাত করে রেখেছে দারোগাকে। এখানে মন্বন্তরের পাশাপাশি নারীব্যবসার কথাও গল্পকার পাঠকমহলে তুলে ধরেছেন।

নারী ব্যবসাকে কেন্দ্র করে রচিত অপর একটি গল্প ‘তীর্থযাত্রা’। এই গল্প সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত –

“সমকালে নারী যেভাবে পণ্যে পরিণত হয়েছিল তারই অনবদ্য চিত্রণ এই গল্পে।”^{২৮}

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসায় এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যাজন-যজন ছেড়ে সে এখন নারী ব্যবসায়ের দালাল। লেখকের কথায় –

“যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসা, নতুন কালের হাওয়ার তার রূপান্তর ঘটেছে। পাঠার নৌকায় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রি করতে চলেছে শহরে।”^{২৯}

এখানে ব্রাহ্মণ পুরুষের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র স্পষ্ট। তবে নরোত্তমের কাছে এটা মানবসেবা, তীর্থযাত্রা। সে ত্রিশ বছরের একদল নারীকে দেবতা দর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে, তবে তার দেবতার মর্ত্যলোকের দেবতা –

“তবে নরোত্তমের দেবতার স্বর্গের দেবতা নয়, এরা একান্তভাবেই মর্ত্যবাসী। যুদ্ধের কন্ট্রাক্টের টাকায় এরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে; প্রতিষ্ঠা করেছে দেবতা কুবেরের আলায় অর্থাৎ গণিকাপল্লি। যাকে বলা যেতে পারে নারী মাংসের কসাইখানা। আর এই পূজামন্ডপে নতুনকালের নতুন বলি হয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে পীড়িত বাংলার নারীরা।”^{৩০}

নরোত্তমের কাছে একাজ পরোপকারের সমান। তার মতে মন্বন্তরে গ্রামে পড়ে থাকার চেয়ে গণিকালয়ে গিয়ে দেহব্যবসা করাই শ্রেয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পসম্বন্ধে যেমনভাবে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের ছবি তুলে ধরেছেন ঠিক একই ভাবে তুলে ধরেছেন মন্বন্তর পরবর্তী বাংলার চিত্র। ‘দুঃশাসন’ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ‘কালোজল’ নামক গল্পটিতে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি, তেমনি রূপায়িত হয়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পরবর্তী বাংলার চিত্র। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের প্রভাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে দেখা দেয় মড়ক, মহামারী। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কলেরা ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণে। গল্পের প্রধান চরিত্র শীতল মাঝি। তারই দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত হয়েছে মন্বন্তর পরবর্তী বাংলার ছবি।

শীতল মাঝির নৌকায় উঠেছে তারাপদ নামে এক যাত্রী। দুর্ভিক্ষের পূর্বে মধুগাঁয়ে শ্বশুরালয়ে সে আশ্রিত ছিল। তার এই কর্মহীন অবস্থা দেখে তার শ্বশুর তাকে কর্মসংস্থানের চেষ্টার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে রেখে শ্বশুরালয় ত্যাগ করে চলে যায় পশ্চিমে। এমনকি শুধু পশ্চিমে নয়, পশ্চিম ছাড়িয়েও আরও অনেক দূরে, দিল্লি লাহোর প্রভৃতি জায়গায়। সেখানে একা আত্মীয়-স্বজনহীন পরিবেশে অনাহারে, কখনো অর্ধাহারে সে দিন কাটায়। পরবর্তীতে সে কাজের সন্ধান পায় পশমের কারখানায়। এতে বেশ স্বাচ্ছন্দে তার দিনযাপন হয়ে যেত। পাঁচ বছর থেকে সে গ্রামছাড়া, তাই পাঁচ বছর পর সে পরিবারের কাছে যাওয়ার জন্য উদ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে গ্রামে যে দুর্ভিক্ষের ঝড় বয়ে গেছে, মন্বন্তরে মারা গেছে গ্রামের অনেক মানুষ সেই পরিবর্তনের কথা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজানা। শীতল মাঝি ছিলেন এই মহামারীর প্রত্যক্ষদর্শী। তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরকালীন পরিবর্তনের চিত্র -

“তিন বছরে কি আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পর গ্রাম। ...শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে।...মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি মাত্র।”^{২১}

গল্পে দেখি আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু আড়িয়াল খাঁ নদী। এই নদীর কালো জলে ভেসে গেছে কত মরা মানুষের দেহ। আড়িয়াল খাঁ নদীর কয়েকটি বাঁক পেরিয়ে তারাপদ যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় তখন সে শ্রীহীন চক্রবর্তী বাড়ি দেখে চমকে উঠে। সেখানে তার বড় শালার স্ত্রী প্রতিমার থেকে জানতে পারে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে শেষ হয়ে যাওয়া তার পরিবারের লোকেদের মৃত্যুর কাহিনি -

“কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। তুমি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। আর অরুনা! পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।”^{২২}

এসব শুনে তারাপদের পা খরখর করে কাঁপতে লাগলো। তার উৎসাহ ব্যাকুলতা সব যেন নিমেষে হাওয়া হয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেল।

এই দুর্ভিক্ষ কলেরা মহামারীর সময় যেখানে লোকেরা খাওয়া পাচ্ছে না, অর্ধাহারে কখনো বা অনাহারে দিন যাপন করছে সেখানে দেখি সেই চোরাকারবারীদের রমরমা ব্যবসা। রাতের অন্ধকারে সেই ব্যবসায়ী শীতল মাঝির নৌকা করে ১০ বস্তা চাল ডাল পাচার করছে বল্লভপুর বাজারে নিজস্ব গোলায়। নৌকার ভাড়া শীতলকে ২০ টাকা দিলেও শীতল জানে যে সে যতই পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে ব্যবসায়ী মথুরা দাস। শীতল মাঝির ভাষায় -

“শুধু একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে! শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ির পাহাড়।”^{২৩}

দুর্ভিক্ষের পর দুর্নিবার ভাবে ভেঙ্গে চলছে আড়িয়াল খাঁ নদী, শ্মশান হয়ে চলেছে গ্রামের পর গ্রাম নীড়ের পর নীড়, কিন্তু তবুও মথুরা দাসের মতো লোকেদের বিবেকবোধ বিন্দুমাত্র টলতে দেখা যায় না।

মন্ত্রস্তর, দুর্ভিক্ষ ও কলেরার পটভূমিতে রচিত অপর একটি গল্প ‘পুষ্করা’। এই গল্পে মহামারীর শরীরী উপস্থিতি যেন লক্ষ্য করা যায় -

“আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ-মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো-দিব্বি আছে, কোন রোগব্যাদির বালাই নাই, হঠাৎ কাটা কৈ মাছের মত খড়ফড় করে মরে যাচ্ছে।”^{২৪}

গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কান্নার শব্দ, পচা মরার গন্ধ, আশেপাশে ঝোপে-ঝাড়ুে মরাখেকো কুকুর আর শেয়ালের ডাক। এ যেন এক বিভীষিকাময় চিত্র। মৃত্যু যেন চারদিক থেকে মানুষকে তেড়ে আসছে, যত সময় পর্যন্ত সবকিছুকে সে গ্রাস করছে না ততক্ষণ যেন আর শান্তি নেই। এই মৃত্যুর বন্যা, কলেরার মড়ক থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আয়োজন করা হয়েছে শ্মশানকালী পূজার। গ্রামের লোকের বিশ্বাস দেবীর কোপেই এই মড়ক দেখা দিয়েছে, তাই দেবীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যেই এই পূজার আয়োজন। গল্পটিতে যেভাবে যুদ্ধ পরবর্তী মানুষের খাদ্যহীনতার চরম রূপ ধরা পড়েছে ঠিক একইভাবে গ্রামের মানুষের অন্ধসংস্কারের চিত্রও ফুটে উঠেছে। দেবীকে শান্ত করার জন্য শুক্লা চতুর্দশীর রাতে মহাশ্মশানে চলছে পূজা। একটু দূরেই একটি কলাপাতার মধ্যে অল্প মাংস আর কয়েকটি চিমসে লুচি দিয়ে দেবীর ভোগ লাগানো হয়েছে। তার উপরে দেওয়া বড় একটি জবা ফুল। এই জবা ফুলটাকে যেন দূর থেকে রক্তের মত মনে হচ্ছে। তিনশো টাকার লোভে তর্করত্ন মহাশয় এসেছেন পূজা করতে, তালুকদার বলাই ঘোষ তাকে এনেছে মায়ের কোপ থেকে সবাইকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু মায়ের দর্শন পাওয়া গেল না। এতে তর্করত্ন মশাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আসলে তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মানুষ নন, দেবদেবীর মাহাত্ম্যে এবং শাস্ত্রে তিনি বিশ্বাসী। তাই দেবীর আগমন না হওয়াতে তিনি বারবার আবেগ ভরা কম্পিত কণ্ঠে দেবীকে আহবান জানাচ্ছেন -

“দেবী প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো - কিন্তু কোথায় দেবী!”^{২৫}
রাতের প্রহর যত ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে ততই তর্করত্নের হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে চলেছে। তিনি শুধু দেবী না এলে কি করণ পরিস্থিতি হবে সেটাই ভাবছেন -

“রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তাহলে-তাহলে - তর্করত্ন আর ভাবতে পারছেন না। অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর - কারো রক্ষা নেই।”^{২৬}

এভাবে কাতর প্রার্থনা করে খানিকটা মদ্যপান করে তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন, হঠাৎ চমকে ওঠেন তিনি -

“বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তার সকাতর প্রার্থনা, দেবী এসেছেন। কালীর মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আঙনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দুহাতে সে শিবাভোগ গো-গ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবোনের একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এলো।...দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তার ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?...অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকরা চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।”^{২৭}

তর্করত্ন জানতেও পারেন না তিনি যাকে শ্মশানকালী ভেবে আবেগে উদ্বেলিত হচ্ছেন সে আসলে মহামারীতে পরিবার হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ এক পাগল ডোম নারী। মড়কের বিষপান করে সে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে রাস্তায় ছটফট করে। এতদিন অনাহারে থাকার পর এই শিবাভোগ তার পেটে সহ্য হয়নি। এক ফোঁটা জলের জন্য সে কালীর মতোই জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। কিন্তু এই সত্য কেউ ভেদ করতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস তাদের পূজা সম্পন্ন হয়েছে, কেটে যাবে মড়ক, মানুষ আবার বেঁচে উঠবে, মহাকালী মহালক্ষ্মী হয়ে উঠবেন এবং পুষ্করা কেটে যাবে।

আলোচনা শেষে বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মন্বন্তর আমাদের দেশে সমাজে সৃষ্টি করেছিল সামাজিক অর্থনৈতিক মূল্যবোধের বিপুল পরিবর্তন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে সেই অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্তরের তাগিদে তিনি তুলে ধরেছেন পীড়িত লোকেদের কথা। তিনি এখানে একক কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের অসহায়তা ও বেদনাকে রূপদান করেননি তিনি সমষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন এবং রচনা করে গেছেন তার শিল্পকর্ম। তাঁর রচনায় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিধ্বস্ত সমাজ, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, মানবিকতার অধঃপতন, কালোবাজারি ব্যবসায়ীর রমরমা ব্যবসা, অসহায় লাঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মর্মবেদনা। যদিও এগুলো ইতিহাসের কথা কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প রচনার মধ্য দিয়ে এই প্রেক্ষাপট যেন আজও সজীব হয়ে আছে পাঠকহৃদয়ে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৫
২. সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা এক, অক্টোবর ২০১৫, পৃ-১৪১
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, বীতংস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জি স্ট্রিট, পৃ. ১৯
৪. তদেব, পৃ. ২০
৫. তদেব, পৃ. ২২
৬. তদেব, পৃ. ২৩
৭. তদেব, পৃ. ২৫
৮. তদেব, পৃ. ২৭
৯. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, বাংলা ছোটগল্প: পর্ব পরীক্ষার, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, পৃ. ১৭৩
১০. সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা এক, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১৫৪
১১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, দুঃশাসন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ. ২
১২. তদেব, পৃ. ২
১৩. তদেব, পৃ. ৮
১৪. তদেব, পৃ. ১৪
১৫. সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা এক, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১৫২
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, গল্পসমগ্র, ৩য় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ২১৭
১৭. তদেব পৃ-২১৫
১৮. সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা এক, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১৫০
১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, গল্পসমগ্র, ৩য় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা পৃ. ১৭৯
২০. সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫৩, সংখ্যা এক, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ১৫০
২১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, দুঃশাসন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ. ২০
২২. তদেব পৃ. ২৪
২৩. তদেব পৃ. ৩০
২৪. তদেব পৃ. ৩৩
২৫. তদেব পৃ. ৪১
২৬. তদেব পৃ. ৩৬
২৭. তদেব পৃ. ৪০-৪১

Bibliography:

আকরগ্রন্থ -

বীতংস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জৈ স্ট্রিট, কলকাতা
দুঃশাসন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জৈ স্ট্রিট, কলকাতা
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ -

দে শিপ্রা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, শৈলী, সি১/৬৬ দক্ষিণী সমবায় আবাস, পর্যায় ২, কলকাতা ৭০০০১৮
চৌধুরী ভাস্কর, ছোটগল্পের অন্দরমহল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
মুখোপাধ্যায় তরুণ, বাংলা ছোটগল্প : পর্ব পর্বান্তর, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা -
৭০০০০৯
সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ:৫৩, সংখ্যা-১, অক্টোবর-২০১৫
সরকার, চিত্রা, সামাজিক সংকট আত্মিক সংকট প্রেক্ষিত বাংলা কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ
মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯
বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
মুখোপাধ্যায় অরুণ, কালের পুস্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
চৌধুরী ভূদেব, বাংলার সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/ বঙ্কিম চ্যাটার্জী
স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০০৩